জীবনের শেষ দিন

মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক

মৃত্যু অবধারিত	৫
দুনিয়ার হায়াত কিভাবে কাটবে?	৮
মৃত্যু নিকটবর্তী হলে কি করবে?	৯
মৃত্যুর মুহূর্তে কি করবে?	১১
মৃত্যুর পর কি করবে?	১২
কাফন-দাফনে দেরী করা নিষেধ	১৩
কাফন-দাফনের কাজ বন্টন করে নিবে	১৬
জানাযা নামাযের সময়	১৭
জানাযা নামাযের ইমাম কে হবেন?	১৯
জানাযা নামাযের ব্যাপারে বদরসম	২০
জানাযা নামাযের পরবর্তী বদরসম সমূহ	২৩
দাফনের তরীকা	২৬
কবর যিয়ারত	২৮
কবর পাকা করা	২৯
ঈসালে ছাওয়াবের তরীকা	৩০
ছাওয়াব রেসানীর ভুল পদ্ধতি	৩৩
মীরাছ বন্টন	৪১
ইয়াতীমের মাল খাওয়া	৪২
ইদ্দতের মাসআলা	৪৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

মৃত্যু অবধারিত

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

অর্থ ঃ "জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে; তারপর যাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে হবে সাফল্যবান। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। [সূরাহ আলে ইমরান ঃ ১৮৫]

তাফসীর ঃ আখিরাতের চিন্তা মূলতঃ যাবতীয় দুঃখ-বেদনার প্রতিকার ও সমস্ত সংশয়ের উত্তর। উক্ত আয়াতে এই

বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। তাই এ দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী জীবনে যদি কখনো কোথাও কাফিররা বিজয়ী হয়েও যায় এবং পরিপূর্ণ আরাম-আয়িশ লাভ করে, আর তারই বিপরীতে মুসলমানগণ যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধর্ম, কোন মতাবলম্বী, কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব দুঃখ-কষ্ট বা আরাম-আয়িশ উভয়টিই কয়েক দিনের জন্যে মাত্র। কোন জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-সাচ্ছন্দ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ না-ও হয়, তবে মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েক দিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং মৃত্যুর পরবর্তী স্থায়ী জীবনের চিন্তা করাই উচিৎ যে, সেখানে কি হবে এবং তার জন্য ঈমান ও আমলের প্রস্তুতি কিভাবে নিতে হবে।

এজন্যই এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখিরাতে নিজের কৃতকর্মের পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিৎ। এ প্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতের আরাম-আয়িশ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি দুনিয়ার সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে উঠে, তবে সেটা একান্তই ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। সে জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে– "দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।" তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে আখিরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে দ্বীনের জন্য কৃত দুঃখ-কষ্ট হবে আখিরাতের সঞ্চয়। [মা'আরিফুল কুরআন, ২ ঃ ২৫৫]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নফস ও খায়েশকে নিজের আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখে।" [মিশকাত শরীফ, ২ ঃ ৪৫১]

দুনিয়ায় হায়াত কিভাবে কাটাবে?

প্রত্যেকের জন্য জরুরী নিজের ঈমান-আমল দুরুস্ত করা। কারণ, এগুলো ঠিক না করে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে (সূরাহ আলে ইমরান)। আরো কর্তব্য হচ্ছে- মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তান তথা বান্দাহর হকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যাতে করে কারোর হক জিম্মায় না থেকে যায়। কারণ, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। হাশরের ময়দানে পাওনাদারকে নেকী দিয়ে তার পাওনা পরিশোধ করতে হবে। যদি তাকে দেয়ার মত নেকী না থাকে বা পাওনা পরিশোধ করতে নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাওনাদারের গুনাহের বোঝা নিজের কাঁধে নিতে হবে এবং নেকীশূন্য ও গুনাহের পাহাড় কাঁধে নিয়ে দোযখে যেতে হবে। হাদীস শরীফে এ ধরনের লোকদেরকে 'আসল মিসকীন' বলা হয়েছে। সুতরাং সারা জীবন এ সব ব্যাপারে তৎপর থাকতে হবে। কারোর নিকট ঋণী থাকলে, সাথে সাথে খাতা বা ডায়েরীতে লিখে রাখতে হয় এবং পরিশোধের জন্য ব্যতিব্যস্ত থেকে যখনই ব্যবস্থা হয়, সেই মুহূর্তে পাওনাদারকে তার পাওনা পৌছে দেয়া জরুরী। যদি নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায় করা সম্ভব না হয়,

তাহলে লজ্জাবোধ না করে পাওনাদারের সাথে যোগাযোগ করে সময় বৃদ্ধি করে নেয়া কর্তব্য। মূর্খ লোকেরা অযথা লজ্জা করে দূরে দূরে থেকে অপরাধী ও হক নষ্টকারী প্রমাণিত হয়। [দ্রঃ মিশকাত শরীফ, ২ঃ ৪৩৫]

মৃত্যু নিকটবর্তী হলে কি করবে?

সারা জীবন আল্লাহর হক ও বান্দাহর হক আদায় করতে চেষ্টায় রত থাকা অবস্থায় যখন অনুভব হয় যে, আমি হায়াতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি বা সম্ভবতঃ আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী, তখন খুব লক্ষ্য করে দেখবে যে, আল্লাহর হক– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি থেকে কোনটা বা কোনটার আংশিক অনাদায় রয়ে গেছে কি-না? যদি থেকে থাকে, তার জন্য ওসীয়ত করে যাওয়া এবং ব্যবস্থা করে যাওয়া জরুরী। যেমন, উমরী কাজা পড়ার পরেও হয়ত কিছু নামায বা রোযা রয়ে গেছে, হয়ত কোন বছরের যাকাত আদায় করা হয়নি বা ফরজ হজ্জ আদায় করা হয়নি, তাহলে এগুলোর জন্য ওসীয়তের মাধ্যমে বন্দোবস্ত করে যাওয়া জরুরী।

তেমনিভাবে এটাও দেখবে যে, বান্দার কোন হক রয়ে গেছে কি-না? বাপ-মায়ের নাফরমানী বা তাদের যথাযথ খিদমত না করা, স্ত্রীর মহর ও হক আদায় না করা, বোন, মেয়ে বা এ জাতীয় অন্য কারো প্রাপ্য হক ঠিকমত না দেয়া বা কারো ঋণ পরিশোধ না করা, অর্থ- সম্পদের ঋণ হোক বা তাদের জান, মাল বা ইজ্জতের ক্ষতি করার ঋণ হোক, যেমন- অবৈধভাবে মানুষের দোষ চর্চা করা, তার ইজ্জতের ক্ষতি করা- এ ধরনের কোন ঋণ বা বান্দার হক রয়ে গেলে, তাও দ্রুত পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবে। অর্থ কড়ির ঋণ টাকা-পয়সা দ্বারা শোধ করতে হবে, সম্পূর্ণ না পারলে যতটুকু সম্ভব তা-ই দিয়ে অবশিষ্ট অংশের জন্য মাফ চেয়ে নিতে হবে। এমনকি যদি মোটেও না দিতে পারে তবু লজ্জা না করে মাফ চেয়ে নিবে। কারণ, দুনিয়ার মামুলী লজ্জা থেকে আখিরাতের আগুন কোটি গুণ ভয়াবহ ও মারাত্মক। কারো গীবত করে থাকলে বা মৌখিকভাবে অনর্থক গাল-মন্দ করে কষ্ট দিয়ে থাকলে তাদের থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। তাদের কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে, তাহলে তার জন্য

ইস্তিগফার করবে এবং সম্ভব হলে তার জন্য কিছু দান-খয়রাত করবে। ইনশাআল্লাহ তাতে সে খুশী হয়ে যাবে।

তাছাড়া নিজে বেশী বেশী ইস্তিগফার করতে থাকবে। কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকবে। আর মৃত্যুর পর তাকে ঘিরে যাতে কোনরকম শরী'আত বিরোধী কাজ-কর্ম না হয়, সেজন্য আত্মীয়-স্বজনকে ওসীয়ত করে যাবে। বিশেষ করে দাফনে যাতে বিলম্ব না করা হয় এবং তিন দিনা, সাত দিনা, ত্রিশা, চল্লিশা, কুলখানী বা অর্থের বিনিময়ে খতম-মীলাদ ইত্যাদির আয়োজন যেন বিলকুল না করা হয়, সেজন্য ওসীয়ত করে যাবে। [দ্রঃ মিশকাত শরীফ ঃ ২৬৫, ৪৩৫]

মৃত্যুর মুহূর্তে কি করবে?

যখন মৃত্যুর সময় একদম নিকটবর্তী মনে হয়, তখন উত্তর দিকে মাথা দিয়ে কিবলামুখী হয়ে শুয়ে বেশী বেশী কালিমায়ে তায়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পড়বে এবং সম্ভব হলে এ দু'আটি পড়বে اَللّٰهُمَّ الْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى - মুমূর্ষ ব্যক্তিকে তার আত্মীয়-স্বজন কালিমার তালকীন করবে এবং

তার নিকট সূরাহ ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, যাতে তার রূহ সহজে বের হয়ে যায়। [দ্রঃ মিশকাত শরীফ, ২ঃ ৫৪৮ / ফাতাওয়া শামী, ২ঃ ১৮৯-১৯১]

মৃত্যুর পর কি করবে?

যখন তার মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন তার হাত-পা সোজা করে দিবে। চক্ষু ও মুখ বন্ধ করে দিবে এবং চাদর দিয়ে ঢেকে দিবে, আর আত্মীয়-স্বজনগণ তার মৃত্যুর খবর এলান করে দিবে এবং তড়িৎ দাফনের লক্ষ্যে পরবর্তী কাজ-কর্ম বন্টন করে নিয়ে সেভাবে আন্‌জাম দিবে। মুর্দার জন্য মনে মনে ইস্তিগফার করতে থাকবে।

মুর্দার পাশে বসে গোসল দেয়ার পূর্বে যে কুরআন পড়ার পদ্ধতি চালু আছে, তা সহীহ নয়; সুতরাং ছাওয়াব রেসানীর জন্য কুরাআনখানী করতে হলে, তা অন্য স্থানে এবং বিনা পারিশ্রমিকে হতে হবে। মৃত্যুর পর চিল্লা চিল্লি করে কাঁদা, রোনাজারী করা, বেপর্দা করা সবই হারাম। হ্যাঁ, চক্ষু অশ্রুসিক্ত ও দিল ব্যথিত হওয়া নিষেধ নয়, বরং এটা সুন্নাত। সুতরাং এতে কোন দোষ নেই এবং এটা সবরের বরখেলাপও

নয়। পার্শ্ববর্তী লোকজন বা আত্মীয়-স্বজনদের কর্তব্য হচ্ছে– মায়্যিতের ঘনিষ্ট আত্মীয়দেরকে সান্ত্বনা দেয়া এবং সবর করতে বলা। [ফাতাওয়া শামী, ২ ঃ ১৯৩ ও ৬ ঃ ২৬ / আহকামে মায়্যিত, পৃষ্ঠা ৩০-৩১, ৯৩]

কাফন-দাফনে দেরী করা নিষেধ

মৃত্যুর পর বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের দেশে দাফনে যে দেরী করা হয়, তা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ, শরী'আতে মুর্দাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেকগুলো স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বেশী দেরী করার অবকাশ নেই। কাজেই মায়্যিতের ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতির জন্য কাফন-দাফনে দেরী করা ঠিক নয়; বরং তারা পরে কবর যিয়ারত করবে। তারা দূর থেকে আসবে এবং দেখবে বলে তাদের জন্য বিলম্ব করা যাবে না। [দ্রঃ মিশকাত শরীফ, ১ ঃ ৬১]

অনেকে মায়্যিতের চেহারা দেখানোর জন্য অনেক সময় নষ্ট করে; অথচ এর জন্য আলাদাভাবে সময় বরাদ্দ করা ঠিক নয়। স্বাভাবিক কাজ-কর্মের মধ্যে এটা সেরে নেয়া কর্তব্য বা

একান্ত জরুরত পড়লে কাফন পরানোর পর জানাযার পূর্বে দেখিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু জানাযার পর দেখানো উচিৎ নয়। এর মধ্যে কয়েক রকম ক্ষতি আছে। চেহারা দেখার ব্যাপারে আরো লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, মুর্দাকে হায়াতে যাদের জন্য দেখা জায়িয ছিল, মৃত্যুর পর শুধুমাত্র তারাই দেখতে পারবে। অন্যদের জন্য দেখা জায়িয নয়। সুতরাং পুরুষের লাশ বেগানা মহিলাদের দেখা নিষেধ। তেমনিভাবে মহিলার লাশ বেগানা পুরুষদের দেখা নিষেধ। তবে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর একে অপরের চেহারা দেখতে পারবে। [দ্রঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ ঃ ২১৯ / ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২ ঃ ৩৯৮ / ফাতাওয়া শামী, ২ ঃ ১৯৫-১৯৮]

অনেকে জানাযার জামা'আতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বলে থাকে যে, এখন সকাল আট ঘটিকায় জানাযা পড়লে জানাযায় লোক সংখ্যা বেশী হবে না, সুতরাং বাদ জোহর– বাদ জুমু'আ জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হবে। তাদের একথাও শরী'আত সম্মত নয়। মৃত্যুর এলানের পর কারোর জানাযায় যদি বেশী লোক উপস্থিত হয়, তাহলে এটা ভাগ্যের বিষয় এবং ফজীলতের জিনিষ। কিন্তু তাই বলে জানাযা

নামাযে বেশী লোক হাজির করার জন্য জানাযা নামাযে খামাখা দেরী করার অনুমতি নেই। এটা গুনাহের কাজ। মুমিনের জন্য কবরে জান্নাতের বিছানা ও জান্নাতের লিবাস প্রস্তুত রাখা হয়। সুতরাং তার জানাযা-দাফন বিলম্ব করে এগুলো থেকে দূরে রাখার অধিকার আমাদের নেই।

অনেককে দেখা যায়– তাদের লাশ দেশের বাড়ীতে বাপ-মায়ের সাথে দাফন করার ওসীয়ত করে যায়। অথচ এরূপ ওসীয়ত সহীহ নয় এবং তা পূর্ণ করাও জরুরী নয়। অনেকে এ ধরনের ওসীয়ত ছাড়াও নিজের আত্মীয়-স্বজনের লাশ দেশে নিয়ে যায়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যায়; অথচ এসব দাফন দেরী হওয়ার কারণ হেতু এ সব কাজ নিষেধ। শরী'আতের ফয়সালা হলো, যে ব্যক্তি যে স্থানে বা যে শহরে মারা গেল, তাকে তার পার্শ্ববর্তী কোন গোরস্তানে দাফন করে দিতে হবে। দূরবর্তী কোন স্থানে লাশ স্থানান্তর না করা কর্তব্য। কারণ, এতে দাফনে বিলম্ব হয় ও নবী (সাঃ)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়। তাছাড়া অনেক টাকা-পয়সারও অপচয় হয়। সুতরাং তা কঠোরভাবে পরিত্যাজ্য।

উল্লেখিত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অথচ সেসবে বেশী শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। কাজেই প্রত্যেকেরই উচিৎ-নিজের সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দেরকে সুস্থ অবস্থায় মাসআলাটি বুঝিয়ে আমল করার জন্য তাকীদ করা, যাতে তার মৃত্যুর পর তার আত্মীয়গণ এরূপ গর্হিত কাজগুলো না করে। এছাড়াও কাফন-দাফনে বিলম্ব হওয়ার আরো যত কারণ আছে, তার সবগুলো পরিহার করা কর্তব্য এবং যতটুকু কম সময়ে সম্ভব কাফন-দাফন কার্য সমাধা করা জরুরী। [দ্রঃ আহকামে মায়্যিত, ৮৫]

কাফন-দাফনের কাজ বন্টন করে নিবে

মৃত্যুর সাথে সাথে কিছু লোক কবর খননের ব্যবস্থা করবে। শক্ত মাটি হলে বুগলী কবর তৈরী করবে, নতুবা সাধারণ কবর খনন করবে। দ্বিতীয় একটি গ্রুপ কাফনের কাপড় খরিদ করে তা প্রস্তুত করবে। পুরুষের জন্য তিন কাপড় ওমহিলার জন্য পাঁচ কাপড় দিবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এর চেয়ে কমেও চলবে। আরেক গ্রুপ গোসলের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করবে। গরম পানি, কর্পুর ইত্যাদির ব্যবস্থা করে গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করবে।

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশী দ্বীনদার, তার মাধ্যমে গোসল দেয়ানো ভাল। এছাড়াও অন্য যে কোন মুসলমান ব্যক্তি গোসল দেয়াতে পারেন। প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দেয়াতে পারে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। সুতরাং এরূপ অপারগতার ক্ষেত্রে স্বামী হাতে কাপড় পেঁচিয়ে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে, গোসলের প্রয়োজন নেই।

গোসল নির্জন স্থানে দিবে– যেখানে অন্য লোকেরা ভীড় জমাবে না। গোসল শেষে কাফন পরিয়ে চেহারা দেখানোর কাজ বাকী থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে তা সেরে জানাযা নামাযের ব্যবস্থা করবে। [দ্রঃ ফাতাওয়া শামী, ২ ঃ ১৯৮ / হিদায়া, ১ ঃ ১৭৯ / আহকামে মায়্যিত, ৩৯-৪০]

জানাযা নামাযের সময়

জানাযা যদি মাকরূহ সময়ে প্রস্তুত হয়, যেমন– সূর্য উঠা, সূর্য মাথার উপর থাকা বা সূর্য ডুবার সময় হয়, তাহলে দাফনে বিলম্ব রহিত করার জন্য সে সময়েই জানাযা পড়ে নিবে। দেরী করার প্রয়োজন নেই। তবে জানাযা প্রস্তুত

হওয়ার পরে অলসতা করে বা কোন কারণে দেরী হওয়ায় যদি উল্লেখিত মাকরূহ সময় এসে যায়,তাহলে সে সময় জানাযা পড়বে না; বরং মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরে জানাযা পড়বে। তবে ফজরের পরে– বেলা উঠার আগে ও আসরের পরে– বেলা ডুবার পূর্বের সময়টা নফল নামাযের জন্য মাকরূহ সময় হলেও জানাযার জন্য মাকরূহ সময় নয়; সুতরাং সে সময় জানাযার নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই।

ফরজ নামাযের জামা'আতের পূর্বে জানাযা প্রস্তুত হলে, যদি জানাযা পড়ে দাফন সেরে এসে ফরজ নামাযের জামা'আত পাওয়া যায় তাহলে দাফন কার্য আগে সারতে হবে। ফরজ নামাযের পরে পড়ার জন্য দেরী করা নিষেধ। এতে দাফন বিলম্ব হয়। আর যদি দাফন সেরে জামা'আত পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ফরজ নামাযের পর জানাযা নামায আদায় করবে। সুন্নাতের পরেও পড়া যায় বা ফরজ নামাযের পরপরই পড়ে নেয়া যায়। তবে বর্তমান যমানায় যেহেতু লোকদের দিলে সুন্নাতের তেমন কোন গুরুত্ব নেই বললেই চলে, তাই জানাযার জন্য বের হলে

অনেকেই সুন্নাত নামায থেকে মাহরূম হয়ে যায় বিধায় ফুকাহায়ে কিরাম সুন্নাত নামাযের পর জানাযা পড়াকে উত্তম বলেছেন। [ফাতাওয়া শামী, ২ঃ ১৬৭ / আহকামে মায়্যিত, ৬৫-৬৬]

জানাযা নামাযের ইমাম কে হবেন?

ইসলামী হুকুমাতের রাষ্ট্র প্রধান বা তার প্রতিনিধি জানাযা নামাযের ইমামতীর প্রথম হকদার। তারা উপস্থিত না থাকলে মৃত ব্যক্তির সন্তান যদি নেক্কার, পরহেজগার আলিম হন, তাহলে তিনিই জানাযার নামায পড়ানোর বেশী হকদার। সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিৎ- ছেলেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য দ্বীনী তা'লীম প্রদান করা। কারণ, নিজের ছেলে যে দিল নিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে, এটা অন্য কারো জন্য সম্ভবপর নয়। আর যদি ছেলে এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন না হয় তাহলে মহল্লার ইমাম জানাযা নামায পড়ানোর বেশী হকদার। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মহল্লার ইমাম জানাযার নামায পড়াবেন। [দ্রঃ ফাতাওয়া দুররে মুখতার, ২ঃ ২১৯ / আহকামে মায়্যিত, ৭৯ পৃঃ]

জানাযা নামাযের ব্যাপারে বদ রসম

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে যে একাধিক বার জানাযা পড়ার প্রথা চালু রয়েছে, তা শরী'আতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। জানাযার নামায একবারই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই বর্তমান প্রথা রহিত হওয়া উচিৎ। তারপরেও এতটুকু অবকাশ থাকে যে, প্রথম জানাযায় যদি মায়্যিতের কোন ওলী, যেমন ছেলে শরীক না হয়ে থাকে, তাহলে ওলীর দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার হক থাকে। কিন্তু প্রথমবার জানাযায় যদি মায়্যিতের কোন ওলী শরীক হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া জায়িয নয়। [দ্রঃ ফাতাওয়া শামী, ২ঃ ২২২-২২৩]

তেমনিভাবে গায়েবানা জানাযার যে প্রথা চালু রয়েছে, তা-ও সহীহ্ নয়। গায়েবানা জানাযা জায়িয থাকলে নবীজী (সাঃ)-এর অনেক প্রিয় সাহাবী (রাযিঃ) বিভিন্ন জিহাদে যে শহীদ হয়েছেন, নবী (সাঃ) অবশ্যই মদীনায় থেকে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়তেন। অথচ নবী (সাঃ) এরূপ করেননি। যে দু'টি ঘটনার উল্লেখ করে কেউ কেউ এ বিষয়টিকে জায়িয বলতে চান, মূলতঃ সেগুলো গায়েবানা

জানাযা ছিল না। নবী (সাঃ) লাশ স্বচক্ষে দেখে দেখে জানাযা পড়িয়েছেন। যদিও লাশ দূরে ছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ ইন্তিজামের কারণে তা সম্ভব হয়েছিল বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। সুতরাং ঐ ঘটনা দ্বারা গায়েবানা জানাযার দলীল পেশ করা মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। [ফতহুল কাদীর, ২ ঃ ৮১ / জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, ২ ঃ ১৮]

জানাযার ব্যাপারে আরেকটি বদ রসম হচ্ছে- বিনা অপারগতায় মসজিদে জানাযা নামায পড়া। শরী'আতের দৃষ্টিতে মসজিদে জানাযা নামায পড়া মাকরূহ। চাই জানাযা ও মুসল্লী উভয়ে মসজিদের মধ্যে থাকুক বা লাশ মসজিদের বাইরে এবং মুসল্লী মসজিদের ভিতরে হোক, সর্বাবস্থায় জানাযা নামায মাকরূহ হবে। এভাবে জানাযা পড়লে, জানাযার ফরজে কিফায়াহ আদায় হয়ে যাবে বটে; কিন্তু জানাযা নামায পড়ার বিরাট ছাওয়াব থেকে মাহরূম হবে। সুতরাং বিনা অপারগতায় কখনো মসজিদে জানাযা নামায না পড়া উচিত। মসজিদের সামনে জানাযার জন্য স্থান রাখা উচিত।

উল্লেখ্য যে, কোন মাঠে-ময়দানেই জানাযা নামায পড়ার নিয়ম। অবশ্য যেখানে জানাযা পড়ার মত কোন স্থান নেই, বা স্থান আছে কিন্তু বৃষ্টি বাদলের কারণে বাইরে তা পড়া সম্ভব হচ্ছে না, এ ধরনের অপারগতার ক্ষেত্রে মসজিদে জানাযা পড়া মাকরূহ হবে না। তবে সেক্ষেত্রেও এতটুকু চেষ্টা করা দরকার, যাতে করে মুর্দাকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করাতে না হয়; বরং ইমাম বরাবর বাইরে কোন ব্যবস্থা রাখতে হবে। [দ্রঃ ফাতাওয়া শামী, ২ঃ ২২৪-২২৫]

অনেক জানাযার ক্ষেত্রে আরেকটি বদ রসম এই লক্ষ্য করা যায় যে, জানাযা নামাযের পূর্বে সমবেত মুসল্লীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক কেমন ছিলেন? সকলে উত্তর দেয়– ভাল ছিলেন। এর ফজীলত বর্ণনা করা হয় যে, তিন জন লোক যদি কারোর ব্যাপারে ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং জান্নাতবাসী করেন। এ হাদীসতো ঠিক, কিন্তু এর অর্থ এভাবে সাক্ষ্য উসূল করা নয়। বরং এর অর্থ– লোকেরা তাদের নিজস্ব আলোচনায় স্বতস্ফুর্তভাবে মুর্দা ব্যক্তির প্রশংসা করবে যে, আহ্ঃ অমুক ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেছে। লোকটা বড় ভাল মানুষ

ছিল। এ ধরনের স্বতঃস্ফুর্ত প্রশংসা যদি মুমিনদের থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে সেটা সত্যিই ভাগ্যের বিষয় এবং ফজীলতের জিনিষ। কিন্তু যবরদস্তি সাক্ষ্য উসূল করার দ্বারা এ ফজীলত হাসিল হয় না। বরং অনেকে বাধ্য হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং এমন কথা মুখে বলে, যা তার দিল স্বীকার করে না। এরূপ করা উচিত নয়।

ইসলামী শরী'আতে মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন আহকাম অর্পিত হয়। সঠিক দ্বীনী জ্ঞান না থাকার কারণে অনেকেই এসব ব্যাপারে গলদ তরীকার আশ্রয় নিয়ে দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে। তাই এ ব্যাপারে শরীয়'আতের সুস্পষ্ট হুকুম জেনে তা পালন করা দরকার এবং বদ রসম ও গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

জানাযা নামাযের পরবর্তী বদরসম সমূহ

জানাযা নামাযের পর অনেক স্থানে দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে দু'আ ও মুনাজাত করা হয়। এটা নাজায়িয। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি-প্রমাণ নেই। শরী'আতের দৃষ্টিতে জানাযা নামাযই হচ্ছে মুর্দার জন্য দু'আ স্বরূপ। সুতরাং উক্ত

দু'আর পর আরেকটি দু'আ করার অর্থ বস্তুতঃ পূর্বের দু'আটি যথার্থ ছিল না মনে করা। এটা যে কত বড় অপরাধ, তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এ রসম বর্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য। [দ্রঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ১ ঃ ৩৩৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১ ঃ ২২৫ / বাহরুর রায়িক, ১ ঃ ১৮৩ / ফাওয়ায়িদে বাহয়িযা, ১ ঃ ১৫২]

তবে দাফন শেষ হওয়ার পর সূরাহ-কালাম পড়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যায়।

আরেকটি বদ রসম হলো– অনেকে জানাযা নামাযের পরে মুর্দার চেহারা দেখায়। অথচ জানাযা নামাযের পর মুর্দাকে আর না দেখানো উচিত। কারণ, এতে দাফনে বিলম্ব হয়, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ [দ্রঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ ঃ ২১৯ / ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২ ঃ ৩৯৮]। দ্বিতীয়তঃ জানাযার পর মুর্দার ব্যাপারে ভাল-মন্দের ফয়সালা হয়ে যায়। তাতে আল্লাহ না করুন, তার চেহারা দেখানো হলে, কোন সময় মানুষের মাঝে কু-ধারণার সৃষ্টি হতে পারে, যা মুর্দার জন্য খুবই খারাপ। কারণ, মানুষের ধারণার ভিত্তিতে অনেক

ফয়সালা হয়ে থাকে। কাজেই জানাযা নামাযের পর চেহারা দেখানোর প্রথা বন্ধ করা উচিত।

আরেকটি বদ রসম এই যে, মুর্দাকে কাঁধে করে কবরস্তানে নেয়ার সময় সকলে উচ্চ স্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে থাকে। এটা ঠিক নয় [দ্রঃ আহকামে মায়্যিত, ২৩৪ / ইমদাদুল মুফতীন, ১৭৬ / আল বাহরুর রায়িক, ২ঃ ১৯১/১৯২ / আদদুররুল মুখতার, ২ঃ ২৩৩]। বরং এক্ষেত্রে স্বাভাবিক গতিতে নীরবে দু'আ-কালাম পাঠ করা, মুর্দার জন্য মনে মনে ইস্তিগফার পড়তে পড়তে কবরস্তানের দিকে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। কোন রকম হাসাহাসি বা রং-তামাশার কথা বলবে না। আবার চিল্লা-চিল্লি করে কান্নাকাটি করবে না এবং মনে মনে চিন্তা করবে যে, আজ যেভাবে আমি মুর্দাকে নিয়ে যাচ্ছি, আগামীতে যে কোন সময় ঠিক এভাবে আমাকেও লোকেরা কাঁধে করে কবরস্তানে দাফন করে আসবে। এর জন্য আমার কি প্রস্তুতি আছে?

অনেক স্থানে মাইয়্যিতের খাটের উপর কালিমা বা আয়াত খঁচিত চাদর দিয়ে মাইয়্যিতকে ঢেকে দেয়া হয়।

আবার অনেকে কাফনের কাপড়ে কুরআনের আয়াত লিখে দেয়। এ সবই নাজায়িয [দ্রঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ১ঃ ৩৫১]। এর দ্বারা কুরআনের আয়াতের বেহুরমতী ও অবমাননা হয় [দ্রঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২ঃ ৪০১]। আয়াতের সাথে নাপাক লেগে গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এ প্রথা পরিহার করে সাধারণ চাদর দ্বারা মুর্দাকে ঢেকে দিবে।

দাফনের তরীকা

কোন অসুবিধা না থাকলে মুর্দার খাট কবরের পশ্চিম পার্শ্বে রাখবে এবং সেখান থেকে তাকে কবরে নামাবে। আর অসুবিধা থাকলে, যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবেই কবরে রাখবে। কবরে নামানোর পর بسم الله وعلى ملة رسول الله - বলে মুর্দাকে সম্পূর্ণ ডান কাতে কিবলামুখী করে শোয়াতে হবে। এটাই সুন্নাত তরীকা [দ্রঃ আদদুররুল মুখতার, ২ঃ ২৩৫ / ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ঃ ৪৮৫ / আহকামে মায়্যিত, ২৩৬]। উল্লেখিত দু'আর মধ্যে এভাবে শোয়ানোর ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু আফসোসের কথা! মুখে তো নবী (সাঃ)-এর

তরীকায় শোয়ানোর কথা স্বীকার করা হয়; কিন্তু কাজ করা হয় তার উল্টা। অর্থাৎ চিৎ করে এমনভাবে মুর্দাকে কবরে শোয়ানো হয়, যা নবী (সাঃ) উম্মতকে শিক্ষা দেননি। সুতরাং মুখের কথার মধ্যে আর কাজের মধ্যে কোন মিল হয় না। এ ব্যাপারে শরী'আতের মাসআলা হল, জীবিত মানুষ যেভাবে সুন্নাত তরীকায় ডান কাতে শয়ন করে, মুর্দাকে সেভাবে কবরে ডান কাতে শোয়ানো সুন্নাত। সুতরাং চিৎ করে শোয়ানো এবং ঘাড় মুচড়িয়ে কোন রকমে চেহারাটাকে কিবলামুখী করা সহীহ নয়। বরং ডান কাতে শোয়াবে। যাতে করে স্বাভাবিকভাবে চেহারা কিবলামুখী হয়ে যায়। এজন্য কোন বিজ্ঞ আলিম বা মুফতী সাহেবের নিকট থেকে কবর খনন করার নিয়ম শিখে নেয়া দরকার। যাতে করে ডান কাতে শোয়ালে লাশ কোন দিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। এ মাসআলাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা কর্তব্য; যাতে আমাদের সকলকে কবরে সহীহ তরীকায় রাখা হয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে সিনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিনার মধ্যে কলব থাকে। আর কলবের মধ্যেই থাকে ঈমান। সুতরাং এটাকে কিবলামুখী করে রাখা উচিত। সিনা এত গুরুত্বপূর্ণ

যে, নামাযে মুখ ঘুরে গেলে নামায মাকরূহ হয়, কিন্তু নামায ভঙ্গ হয় না; অথচ সিনা ঘুরে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষে সিনা আসমানের দিকে রেখে দাফন করার যে গলদ তরীকা চালু হয়ে গেছে, তার অবসান হওয়া নেহায়েত প্রয়োজন।

কবর যিয়ারত

হাদীস শরীফে কবর যিয়ারতের নির্দেশ ও ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সন্তানের জন্য প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। [দ্রঃ মিশকাত শরীফ, ১ ঃ ১৫৪ / রদ্দুল মুহতার, ২ ঃ ২৪২] সুতরাং সম্ভব হলে এটা করা উচিত। প্রতি শুক্রবার সম্ভব না হলে, যখনই সুযোগ হয় তখনই পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুরুব্বীদের কবর যিয়ারত করবে। এতে আখিরাতের কথা স্মরণ হয় এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সহজ হয়। কবরে মায়্যিতকে দাফন করার পরও কবর যিয়ারত করা যায় এবং একাকী বা সম্মিলিতভাবে দু'আ করা যায়। কবর যিয়ারতের নিয়ম এই যে, সম্ভব হলে মুর্দার পায়ের দিক দিয়ে

কবরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে গিয়ে পূর্বমুখী হয়ে অর্থাৎ মুর্দার চেহারা মুখী হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে এভাবে কবরবাসীদের সালাম করবে ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ —

এরপর সম্ভব হলে সূরাহ ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে বা কম পক্ষে সূরাহ ফাতিহা একবার, সূরাহ ইখলাস তিনবার এবং দরূদ শরীফ এগার বার পড়ে মুর্দার জন্য ছাওয়াব রেসানী করবে। যদি ঐ অবস্থায় পূর্বমুখী হয়ে দু'আ করে, তাহলে হাত তুলবে না। আর যদি কিবলামুখী হয়ে দু'আ করে, তাহলে হাত তুলতে পারে। এরপর আদবের সাথে কবরস্তান থেকে চলে আসবে এবং কবরবাসীদের থেকে নসীহত হাসিল করবে। [দ্রঃ রদ্দুল মুহতার, ২ ঃ ২৪২ / ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ ঃ ৫০০ / আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ ঃ ২১২]

কবর পাকা করা

কবরকে পাকা করা বা কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা

শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ ও গুনাহের কাজ। সুতরাং কঠোরভাবে এর থেকে বিরত থাকা কর্তব্য [দ্রঃ আদদুররুল মুখতার, ২ঃ২৩৮ / ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ঃ৪৯৮]। তবে গোরস্তানের চতুর্পার্শ্বে দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া যায় বা কবরের চার পাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে কবরকে হিফাজত করা যায় এবং হিফাজত করা কর্তব্যও। যাতে গরু-ছাগল কবরের উপর চলাচল করে বা পেশাব-পায়খানা করে কবরের বেহুরমতী করতে না পারে।

ঈসালে ছাওয়াবের তরীকা

মুর্দা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ছাওয়াব রেসানী করা তাদের হক এবং এটা জীবিতদের কর্তব্য। জীবিতগণ মুর্দা পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের ব্যাপারে যতটুকু করবে, তারা মৃত্যুর পর তাদের জীবিত আত্মীয়দের থেকে সেরূপ আচরণ পাবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর দরবারে কিভাবে দু'আ করতে হবে, তার শব্দগুলোও শিখিয়েছেন এবং দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন; আর তা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন [দ্রঃ সুরাহ

বনী ইসরাঈল, ২৪]। সুতরাং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ঈসালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী করা খুবই দরকার। হাদীস শরীফে এসেছে, "মানুষকে যখন কবরে দাফন করা হয়, তখন তার অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়ে যায়। নদীতে বা সাগরে যদি জাহায তলিয়ে যায়, তখন মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে হাত মারতে থাকে এই ধারণায় যে, হাতে কোন কিছু আসে কি-না– যা আঁকরিয়ে ধরে সে জান বাঁচাতে পারে, মুর্দারও সেই অবস্থাই হয় এবং সে জীবিতদের ছাওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। তখন তার আপনজন, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব যদি কিছু ছাওয়াব রেসানী করে, তাহলে আল্লাহ-তা'আলা সেটাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে জীবিতদের পক্ষ থেকে তাদের খিদমতে হাদিয়া হিসেবে পৌঁছে দেন [দ্রঃ মিশকাত, ২০৬] এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অনেকে না জানার কারণে ছাওয়াব রেসানী অস্বীকার করে থাকে। এটা ভুল। বরং ছাওয়াব রেসানী সহীহ ও সুন্নাত।

তবে ছাওয়াব রেসানীর পদ্ধতি শরী'আত সম্মত হওয়া উচিত। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে ছাওয়াব রেসানী বাতিল বলে

গণ্য হয় এবং মুর্দার কোন ফায়িদা হয় না। এর সহীহ্ তরীকা হল মুর্দার নিজস্ব বা আপন লোকজন,বন্ধু-বান্ধবগণ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে পূর্ণ কুরআন শরীফ বা এর অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করে বখশে দিবে। বখশে দেয়ার জন্য আলাদা কোন মৌলবী সাহেবকে ডেকে আনা বা বলা জরুরী নয়; বরং প্রত্যেকে যদি তিলাওয়াতের আগে বা পরে নিয়ত করে নেয় যে, আমি যে তিলাওয়াত করছি, হে আল্লাহ! এর সাওয়াব অমুক পাবে, তাহলে তিলাওয়াতের সাথে সাথে সেই মুর্দা বা যিন্দাহ্ যার নিয়ত করা হবে, তার আমলনামায় ছাওয়াব পৌঁছে যাবে। নতুন করে ছাওয়াব পৌছানোর দরকার নেই। সম্ভব হলে আত্মীয়-স্বজন কুরআন তিলাওয়াত করে ও সত্তর হাজার বার কালিমায়ে তাইয়্যিবা পড়ে ছাওয়াব রেসানী করবে। তাছাড়া নিজেদের পয়সা থেকে ছাওয়াব পৌছানোর নিয়তে কিছু দান-খয়রাত করবে। যে কোন দিন সহজে সম্ভব হয় গরীব-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়াবে এবং সারা বছর বরং সারা জীবন, যখন যেভাবে ও যতটুকু সম্ভব হয়, ছাওয়াব রেছানী করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তাদের জন্য দু'আ করবে। এটাই সহীহ্ পদ্ধতি।

ছাওয়াব রেসানীর ভুল পদ্ধতি

ছাওয়াব রেসানীর নামে বর্তমানে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার যে প্রথা চালু হয়েছে– শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনএসব ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। মূর্খতার দরুন এসব বিদ'আত ও বদ রসম মুসলমানগণ ভাল কাজ মনে করে চালু করে দিয়েছেন, অথচ এগুলো মারাত্মক গুনাহ। অনেকের এ ধরনের গুনাহ থেকে তওবাহ নসীব হয় না। সুতরাং এগুলো অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য। সারা বছর বাপ-মায়ের জন্য ছাওয়াব রেসানী করতে থাকবে। একদিন যদি একটু বেশী করতে মনে চায়, তা করবে, কিন্তু সেটা ঠিক মৃত্যুর তারিখে করবে না। অন্য যে কোন দিন করবে এবং সেটাকে জরুরী মনে করবে না।

ছাওয়াব রেসানীর জন্য অনেকে তিন দিনা, সাত দিনা, ত্রিশা, চল্লিশা বা এজাতীয় রসমী অনুষ্ঠান করে, কুলখানী করে, মিলাদ পড়ায়, খানা খাওয়ায় ইত্যাদি। এটা ভুল ও হিন্দুয়ানী তরীকা [দ্রঃ রদ্দুল মুহতার, ২ ঃ ২৪০ / আহকামে মায়্যিত, ২৪১ / ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৫ ঃ ৪৪৭ / রহীমিয়া, ১ ঃ ৩৯৬]।

বলা বাহুল্য মুর্দাকে কবরে রাখার পরবর্তী মুহূর্ত হতেই সে সন্তানাদি বা আত্মীয়দের পক্ষ থেকে ছাওয়াব রেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। আর আত্মীয়গণ চায় ত্রিশ দিন বা চল্লিশ দিন পর তা পাঠাতে। কত বড় নির্বুদ্ধিতা! কারো পিতা যদি কোন কারণে জেলে যায়, তাহলে কোন আহমক ছেলে আছে কি, যে চল্লিশ দিন পরে পিতাকে জেল থেকে বের করার তদবীর শুরু করে? নিশ্চয়ই না সুতরাং ত্রিশা-চল্লিশা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। [দ্রঃ ফাতাওয়া রশীদিয়া, ১৩৭]

অনেকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত ও শবীনা খতম পড়িয়ে ছাওয়াব রেসানী করে অথবা এমনিতেই হাদিয়া বলে তিলাওয়াত কারীদের কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে থাকে। তাদের এ কাজ হারাম ও নাজায়িয। এতে তারাও গুনাহগার হয়, পড়নেওয়ালাও গুনাহগার হয় এবং হারাম পয়সা গ্রহণ করে। আর মৃতব্যক্তির আমলনামায়-কিছুই পৌঁছে না [দ্রঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ১ঃ ৩৭৫]। কারণ, এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান হল, প্রথমে

পড়নেওয়ালা সাওয়াব পায়, তারপর তিনি যার জন্য বখ্‌শে দেন, সে ব্যক্তি পায়। আর পড়নেওয়ালা যদি বিনিময় গ্রহণের আশায় পড়ে বা পড়ার কারণে বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে গলদ নিয়তের কারণে সে নিজেই কোন ছাওয়াব পায় না বা তার ছাওয়াবই বাতিল হয়ে যায়, এরপর সে ব্যক্তি যদি অন্যকে বখ্‌শে দেয়, তাহলে কি জিনিষ বখ্‌শে দিল? তার কাছে তো কোন ছাওয়াবই নেই। সুতরাং বর্তমানে এ জাতীয় যে প্রথা চলছে, কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ নাজায়িয এবং ধোকা ও প্রতারণার শামিল। [দ্রঃ রদ্দুল মুহতার, ৬ ঃ ৫৬ - ৫৭ / আহসানুল ফাতাওয়া, ১ ঃ ৩৭৫] হাশরের ময়দানে দেখা যাবে, মুর্দা বাপ-মায়ের আমলনামায় কিছুই পৌঁছেনি। তখন বুঝে শুনে এভাবে যারা হারাম পয়সা গ্রহণ করেছে, তাদের চরম বেইজ্জতী হবে। সুতরাং নিজেরাই যতটুকু পারে, পড়ে ছাওয়াব বখশে দিবে। তিন বার সূরাহ ইখলাস পড়লে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের ছাওয়াব পাওয়া যায়। এটা পড়ে দিবে বা এমন আলিম দ্বারা পড়াবে—যারা ছাওয়াব রেসানীর বিনিময় গ্রহণ করবেন না। এর জন্য উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে—আলিম-উলামার সঙ্গে সম্পর্ক

কায়িম করবে এবং তাদের নিকট সর্বদা যাতায়াত করবে। তাহলে তার বা তার আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে সেই আলিমগণের তিলাওয়াত অবশ্যই পাবে ইন্‌শাআল্লাহ। খবরদার! অনর্থক রসম পালন করবে না। কারণ, তাতে কোন ফায়িদা তো নেইই; বরং হারাম পন্থায় পয়সা দেয়ার কারণে গুনাহগারও হতে হয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ায়, যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্য, রোগ-ব্যাধি ভাল হওয়ার জন্য, তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিময় দেয়া ও নেয়া উভয়টা জায়িয, এতে কোন অসুবিধা নেই। [দ্রঃ বুখারী শরীফ, ২ঃ৮৫৪ / মুসলিম শরীফ, ২ঃ২২৪] কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে ছাওয়াব রেসানীর খতমের বিনিময়কে জায়িয বলা, হারাম বিষয়কে হালালে পরিণত করার অপচেষ্টা ও মহাপাপ।

ছাওয়াব রেসানীর আরেকটি তরীকা হচ্ছে- মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানো। অনেকে মায়্যিতের ইজমালী সম্পত্তি থেকে খানা খাওয়ায়। এক্ষেত্রে সকল ওয়ারিছ যদি বালিগ হয় এবং

সকলের পরামর্শে বা অনুমতিতে যদি তা হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন একজন ওয়ারিছও যদি নাবালিগ বা পাগল থাকে, তাহলে এরূপ করা নাজায়িয হবে এবং এই খানা খাওয়াও নাজায়িয হবে। এর দ্বারা ইয়াতিমের মাল খাওয়ার গুনাহ হবে- যদিও ঐ নাবালিগ অনুমতি দেয়। কেননা, শরী'আতে তার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য উত্তম পদ্ধতি হল- বালিগ-ওয়ারিছগণ নিজস্ব সম্পদ থেকে তাওফীক অনুযায়ী খাওয়াবেন।

ছাওয়াব রেসানীর প্রচলিত আরেকটি বদ রসম হল- মাইকে শবীনা বা খতম পড়ানো। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর মধ্যে অনেকগুলো হারাম কাজের সমন্বয় পাওয়া যায়। যেমন, রিয়াকারী, লোক দেখানো, কুরআন তিলাওয়াতে বে-হুরমতী ইত্যাদি। সুনাম ছড়ানোর উদ্দেশ্য না হলে মাইকে পড়ার দরকার কি? আল্লাহ তো আর বধির নন। তাছাড়া গ্রামবাসীও তো তার নিকট মাইকে কুরআন শুনানোর দরখাস্ত করেনি। তাহলে নাম কামানো ছাড়া আর কি ফায়িদা থাকতে পারে? এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা সারারাত মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে মহা সমস্যায় ফেলা হয়। আশে পাশের লোকজন

অস্থির হয়ে যায়। অথচ শরী'আতে কাউকে সমস্যায় ফেলার অনুমতি নেই। তেমনিভাবে এর দ্বারা রাত্রে যারা জিকর-আজকার ও তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের ইবাদত- বন্দেগী নষ্ট করা হয়। এভাবে অনেকগুলো হারামের সমষ্টির নাম হচ্ছে প্রচলিত শবীনা। তারপর যদি অর্থের বিনিময়ে হয়, তাহলে তো গুনাহের মাত্রা কয়েক গুণ বেশী হয়ে যায়। এরপর এসব হারাম ও গুনাহের সমষ্টিকে ছাওয়াব মনে করা আরেকটি হারাম এবং ঈমানের জন্য তা মারাত্মক হুমকি স্বরূপ, আর এতসব হারামকে ছাওয়াব মনে করে বাপ-মায়ের রূহে বখশে দেয়া যে কত বড় অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং এসব রসম বন্ধ করা একান্ত জরুরী [দ্রঃ মিশকাত শরীফ, ৪০৩ / ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১ ঃ ১৮৮ / আযীযুল ফাতাওয়া, ৯৮ / আহসানুল ফাতাওয়া, ১ ঃ ৩৪৮] তবে অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, কোথাও জায়িয পন্থায় সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত হয় বা কুরআন শরীফের খতম হয় এবং অনেক লোক আদবের সাথে সেই তিলাওয়াত শুনতে আগ্রহী হয়, আর তিলাওয়াত কারীর আওয়ায তাদের সকলের নিকট পৌঁছতে মাইকের প্রয়োজন হয় এবং এমন সাউন্ড বক্স

ব্যবহার করা হয়–যার আওয়াব উক্ত মজলিসে সীমাবদ্ধ থাকে, অতে লোকদের অসুবিধা না হয়, তাহলে এ ধরনের ব্যবস্থা করতে কোন অসুবিধা নেই।

ছাওয়াব রেসানীর আরেকটি গলদ প্রথা হল– প্রচলিত পদ্ধতিতে মিলাদ পড়ানো। যার মধ্যে সূরাহ-কিরাআত তেমন কিছু পড়া হয় না, নবী (সাঃ)-এর সুন্নাতেরও কোন আলোচনা হয় না, বরং (ক) কিছু আরবী-ফার্সী বাংলা কবিতা গাওয়া হয়। (খ) তাওয়াল্লুদ-এর নামে এক উদ্ভট জিনিস পড়া হয়, যার প্রমাণ শরী'আতে নেই। (গ) এরপর দরূদের নামে 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' ইত্যাদি পড়া হয়, অথচ এটা কোন দরূদ নয়। নবী (সাঃ) উম্মতের জন্য বহু দরূদ রেখে গেছেন– যা সহীহ হাদীসে বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে এ ধরনের কোন দরূদ নেই। যেভাবে পড়া হয় এবং যা পড়া হয়, এর শব্দগুলোও সহীহ নয়। আর এগুলো আরবী ব্যাকরণেরও পরিপন্থী এবং এর অর্থও সহীহ নয়। এগুলোর ব্যাখ্যা কোন মুহাক্কিক আলিম থেকে জেনে নিবেন। এ ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। উল্লেখিত তিনটি গলদের সমষ্টির নাম হচ্ছে মিলাদ বা মৌলূদ শরীফ। এর মধ্যে

ছাওয়াব হওয়ার মত কিছুই নেই। এরপরও সেটাকে মহা ছাওয়াবের কাজ মনে করে বখশে দেয়া হচ্ছে। উম্মত দ্বীনী ইলমের ব্যাপারে মূর্খতার চরম সীমায় পৌঁছার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

তবে কেউ যদি সহীহভাবে মীলাদ বা দু'আ করতে চায়, তাহলে তার পদ্ধতি হল– কুরআনে কারীম থেকে সূরাহ ইখলাস বা সূরাহ ইয়াসীন বা অন্য কোন সূরাহ তিলাওয়াত করবে। নবী (সাঃ)-এর সুন্নাত (যা তাঁর দুনিয়ায় আগমনের এবং মিলাদের প্রধান উদ্দেশ্য, তার) থেকে কিছু বর্ণনা করবে এবং সহীহ হাদীসে যে সব দরূদ বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে যেটা সহজ মনে করা হয়, প্রত্যেকে নিজস্বভাবে এগারবার বা কমবেশী পড়ে নিবে। এরপর উপস্থিত লোকেরা সকলে মিলে দু'আ করে নিবে। এরূপ মিলাদ যদি ছাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে পড়ানো হয়, তাহলে কোন বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয হবে না। আর যদি দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে পড়ানো হয়, তাহলে বিনিময় গ্রহণ ও লেন-দেন করতে অসুবিধা নেই।

উল্লেখ্য, ছাওয়াব রেসানীর লক্ষ্যে এলান করা, লোকজন একত্র হওয়া, শোকসভা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। মৃত্যু সংবাদ জানার পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকে নিজের স্থানে থেকে যতটুক সম্ভব কুরআন তিলাওয়াত করে বা তিন বার সূরাহ ইখলাস পড়ে ছাওয়াব রেসানী করে দিবে। এটাই সহীহ তরীকা।

তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, কোথাও জায়িয কোন উদ্দেশ্যে লোকজন জমা হয়েছে, যেমন– ওয়াজ মাহফিলে বা মাদ্রাসার মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক এমনিতেই উপস্থিত থাকেন। তারা কোন সময় বা নামাযের পর মুর্দার জন্য দু'আ করে দিলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই।

মীরাছ বন্টন

মায়্যিতের কাফন-দাফনের পর বেশী বিলম্ব না করে তার মীরাছ বা পরিত্যাক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি বন্টন করে হকদারকে বুঝিয়ে দেয়া কর্তব্য। বিশেষ করে যদি কোন ওয়ারিছ নাবালিগ থাকে, তখন বিষয়টি আরো বেশী জরুরী হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন হক্কানী মুফতী সাহেব বা আলিম দ্বারা

মীরাছ বন্টন করে সকলকে বুঝিয়ে দিবে এবং নাবালিগ ছেলে বা মেয়ের অংশ এ ইয়াতিমের যিনি অভিভাবক বা মুরুব্বী হবেন, যিনি তাকে ও তার ধন-সম্পদ দেখাশুনা করবেন, তার হাতে বুঝিয়ে দিবে। এটা খুবই জরুরী। [দ্রঃ সূরাহ নিসা আয়াত, ৬ / মাআরিফুল কুরআন, ২ ঃ ৩০৬]

ইয়াতীমের মাল খাওয়া

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইয়াতীমের মালের সঠিক তদারকী করা হয় না। যার পরিণতিতে ইয়াতীম নাবালিগ সন্তানের মুরুব্বী যেমন, মা বা বড় ভাই যারা থাকে, তারা নিজেরাই ইয়াতিমের মাল খেয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানদের খাওয়ায়ে থাকে। মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করে থাকে। অনেক বছর পর ইয়াতিম বাচ্চা যখন বড় হয়, তখন তাকে শুধু জমি ও বাড়ী ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয়া হয়। অথচ এত বৎসর তার ঐসব সম্পত্তি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয়েছে বা ভাড়া পাওয়া গিয়েছে বা উপার্জন হয়েছে, তা থেকে তার পিছনে এর সবটা ব্যয় হয়নি। অথচ এ বর্দ্ধিত অংশ নিজেরা খরচ করে ফেলে, ইয়াতিমকে বুঝিয়ে দেয় না। মনে রাখবেন– এ

সবই ইয়াতিমের মাল খাওয়ার দরুন হারাম ও জাহান্নাম খরীদ করার শামিল।

ইয়াতীম অর্থাৎ নাবালিগ সন্তান বড়দের সমান অংশ পাবে। কোন ব্যাপারে এক কড়া-ক্রান্তিও কম পাবে না। তারপর উক্ত মাল থেকে তার ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা ও লেখা-পড়ার জন্য খরচ করতে থাকবে এবং অবশিষ্ট অংশ তার নামে হিফাজত করতে থাকবে। যখন ইয়াতিম সন্তান বালিগ ও বুদ্ধিমান হবে, তখন তার সমুদয় সম্পত্তি এবং তার থেকে বর্দ্ধিত আয় তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটি বড়ই নাজুক। কারণ, কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "যারা অবৈধভাবে ইয়াতিমের মাল খায়, তারা তাদের পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন খায়।" (সূরাহ নিসা)

উল্লেখ্য, শুধু মৃত গরীবের সন্তানকেই ইয়াতীম বলা হয় না; বরং কোটিপতির নাবালিগ ছেলে বা মেয়েও ইয়াতীম। সুতরাং তাদের মাল কোনভাবে খাওয়াও ইয়াতীমের মাল খাওয়া এবং জাহান্নামের আগুন খাওয়ার নামান্তর।

বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেয়া জরুরী। এ ব্যাপারে আরো একটি মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে যে– সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনদের অংশ দেয় না বা দিলেও সামান্য কিছু দিয়ে বিদায় করে দেয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়– বোনেরা লৌকিকতা করে ভাইদেরকে বলে যে, আমি অংশ নিব না। ভাইকে দিয়ে দিলাম। বোনদের এ কথায় ভাইয়েরা তো মহাখুশী। বোনদের খুবই আদর– যত্ন শুরু করে দেয়। তারা একবারও চিন্তা করে না যে, বোনেরা একথা কেন বলে? তাদের কি সম্পদের প্রয়োজন নেই? না, তাদের সন্তান নেই? সবই তো আছে, তাহলে তারা কেন ছাড়ছে? আসল কথা এই যে, অনেক বোনেরা মনে করে যে, আমি যদি বাপের অংশ গ্রহণ করি, তাহলে বাপের ভিটায় আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, ভাইয়েরা স্থান দিবে না, খাতির তোয়াযও করবে না। সুতরাং সে রাস্তা জারী রাখার জন্য যখন দেখে যে এর বিকল্প নেই, তখন তারা লৌকিকতা করে তাদের অংশের দাবী ছেড়ে দেয়। অথচ এভাবে দাবী ছাড়লে উক্ত সম্পত্তি ভাইয়ের জন্য কখনো হালাল হয় না, অন্তরের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে একজনের মাল অপরের জন্য হালাল নয়। [দ্রঃ মিশকাত

শরীফ, ২ ঃ ৪১৯ / মিশকাত শরীফ, ১ ঃ ২৬১ / ফাতাওয়া রহীমিয়া, ২ ঃ ২৫৫]

সুতরাং বোনদেরকে ঠকানো বা লৌকিকতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মাল অবৈধ ও হারাম। এতে বান্দাহর হক নষ্ট করা হয়, যা মহাপাপ। এটা এত বড় পাপ যে, আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের ময়দানে এর বদলে নেকী দিতে হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারদের গুনাহর বোঝা নিতে হবে। তাছাড়া এর দ্বারা হারাম খাওয়া হয় এবং সন্তানদের হারাম খাওয়ানো হয়। এতে সন্তান নাফরমান হয়ে যায়। সুতরাং কখনো এ ধরনের লোভ করা উচিত নয় এবং এ রাস্তায় পা রাখার ইরাদাও করা উচিৎ নয়।

এ ব্যাপারে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি হল, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা বোনদের ন্যায্য অংশ তাদের বুঝিয়ে দিবে এবং তাদের লৌকিকতার দান গ্রহণ করবে না; বরং বুঝিয়ে বলবে যে, তোমাদেরও মালের প্রয়োজন আছে, তোমাদের সন্তানাদিরও মালের প্রয়োজন পড়বে। সুতরাং তোমাদের অংশ অবশ্যই তোমরা নিয়ে যাও। আমি আজীবন

আমার নিজের মাল দ্বারা সাধ্যানুযায়ী তোমাদের খিদমত ও দেখাশুনা করবো ইনশাআল্লাহ। কারণ, আমার নবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, কেউ যদি নিজের হায়াতের মধ্যে ও মালের মধ্যে বরকত চায়, তাহলে সে যেন সিলারেহমী করে অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে বোন, ফুফু ও খালাদের খিদমত করে ও খোঁজ খবর রাখে। [দ্রঃ মা'আরিফুল কুরআন বাংলা সৌদী সংস্করণ, ২৩৬/আযীযুল ফাতাওয়া, ৭৮৩/ ইমদাদুল মুফতীন, ১০৫১]

এভাবে বুঝিয়ে বললে দেখা যাবে– তারা তাদের অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, এভাবে বুঝিয়ে বলে যখন তাদেরকে অংশের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে, এরপরও কোন বোন যদি নিজের মালের একাংশ নিজের ভাইকে হাদিয়া দেয়, তাহলে সেটা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। বরং এটা ভাইয়ের জন্য হালাল হবে।

মহিলাদের মহরের ব্যাপারটি এর উপর ভিত্তি করে বুঝে নেয়া কর্তব্য। কোন চাপে বা লৌকিকতা করে যদি তারা মহর মাফ করে দেয়, তাহলে কখনো মাফ হবে না। বরং

পরিশোধের পর বা পূর্ণ রূপে তাদের মালিকানা বুঝিয়ে দেয়ার পর যদি তাথেকে কিছু হাদিয়া দেয়, তা গ্রহণ করা জায়িয। অন্যথায় নয়।

ইদ্দতের মাসআলা

স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলাদের জন্য চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। আর সন্তান পেটে থাকলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়। ইদ্দত পালনের অর্থ হল– স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে বসবাস করতো, উল্লেখিত সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ঐ ঘরেই বা বাড়ীতে তাকে অবস্থান করতে হবে। চিকিৎসা বা জীবিকার প্রয়োজন ছাড়া বাড়ী থেকে বের হওয়া জায়িয নয়। সুতরাং ইদ্দত অবস্থায় কোথাও বেড়াতে যাওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া বা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া নাজায়িয ও হারাম। তাছাড়া ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন রকম সৌন্দর্য ইখতিয়ার করাও নিষেধ। কাজেই ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অলংকার পরা, হাতে মেহেদী পরা, আতর বা খুশবু লাগানো, সাজ-গোজের কাপড় পরা, চুল আঁচড়ানো বা এ ধরনের যত সাজ-সজ্জা মহিলারা করে থাকে, তার সবই

নিষেধ। এ অবস্থায় একদম সাদাসিদাভাবে থাকা জরুরী। বর্ণিত মাসআলাটি সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ মহিলারা অজ্ঞ। সুতরাং মাসআলাটির ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা ও প্রচার করা জরুরী। [প্রমাণ ঃ আদদুররুল মুখতার, ৩ ঃ ৫১০/৫১১/৫৩১, হিদায়া, ২ ঃ ৪২৩, হিদায়া, ৩ ঃ ৪২৭]

সমাপ্ত